দীনবন্ধুর

নীলদর্পণ

উদ্দেশ্যমুখী বক্তৃতার তটে একটি উল্লসিত জীবন-তরঙ্গ

॥ এক ॥

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "নীলদর্পণ বাঙ্গালার আঙ্কল টম্‌স কেবিন। টমকাকার কুটির আমেরিকান কাফ্রীদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।" ইংরেজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়। জেম্‌স লঙ্‌ মধুসূদনকে দিয়ে এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করান। এর জন্য স্বজাতির কাছে লঙ্‌ সাহেবকে যে কতভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে তার কথা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। সমকালীন যুগে নীলদর্পণ বাঙালির মনে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। নীলদর্পণ নাটকটি সেকালে বাংলাদেশে এক বিশিষ্ট সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্য লাভ করেছিল। জাতির মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ন্যায় বিশিষ্ট স্থান আর কোন রচনাই লাভ করতে পারে নি।

পরে নানা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে নীলচাষ বাংলা দেশ থেকে লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙালির মনে নীলদর্পণের আকর্ষণ সক্রিয় ছিল। এই নাটকের পটভূমিকায় বাঙালি তার ইংরেজবিদ্বেষ এবং স্বাধীনতাসাধনার মূল ভাববীজের সন্ধান করেছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই নাটকের জাতীয়তাবাদের সুর সাময়িক ঘটনার সীমা লঙ্ঘন করে বাঙালির কানে ব্যাপকতার সঙ্গীত

বাজিয়েছে। দেখা যাচ্ছে নীলদর্পণ রচনায় দীনবন্ধু সাময়িক বিশিষ্ট ঘটনার উপরে নির্ভর করেছেন, কিন্তু নীলদর্পণ সেই ঘটনার সাময়িকতায় আবদ্ধ থাকে নি। প্রত্যক্ষত নীলচাষীদের এই কাহিনী স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা বলে নি, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এ নাটক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহগামিতা করেছে।

নীলদর্পণের সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য তাই অস্বীকার করা যায় না, এবং আজ পর্যন্ত কোন সমালোচক তা করেনও নি। কিন্তু এর সাহিত্যমূল্য বিচারই বর্তমান আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য। সাময়িক কোন সামাজিক মূল্য সাহিত্য-বিচারের নিরিখ হতে পারে কি না এটিই হল প্রথম প্রশ্ন। মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কোন তথ্য-বিচার হয়ত বহু যুগ ধরে ইতিহাসে সমাদৃত হয়, কিন্তু সে-দলিল সাহিত্যের আসরে প্রবেশাধিকার পায় না। সাময়িক কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনে স্নাত রচনা প্রায়ই উদ্দেশ্য-প্রচারে মুখর হয়ে থাকে, এবং ঐ বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণত নিমজ্জিত রাখে। সাহিত্য উদ্দেশ্য-প্রচার থেকে মুক্তি খোঁজে এবং ঐতিহাসিক সাফল্যে সার্থকতার স্বর্গলাভ হল বলে মনে করে না। সে মানব-হৃদয়ে স্থান লাভ করতে চায়। নীলদর্পণ রাজনৈতিক মাহাত্ম্য-নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য হিসেবে কতটা মূল্যবান তার বিচারের মধ্যেই আছে নীলদর্পণের প্রকৃত স্থায়িত্বের কারণ।

। দুই ।

নীলদর্পণ নাটকটির সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তবুও সাধারণ অর্থে যে সব রচনাকে আমরা ঐতিহাসিক নাটক নামে

আখ্যাত করি নীলদর্পণকে তাদের সমগোত্রীয় বলে কিছুতেই মনে করা চলে না। নীলদর্পণকে কেন্দ্র করে আমাদের 'ঐতিহাসিক নাটক' সম্বন্ধীয় বোধকে খানিকটা পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া যেতে পারে।

নীলদর্পণ নাটকে যে সব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে তা নাকি বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা অধ্যাপক চাকলাদারের নীলদর্পণ বিষয়ক ঐতিহাসিক বিবরণে সে কথা লেখা হয়েছে। 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যেও বলা হয়েছিল, "নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।" "Indian Stage" নামক গ্রন্থে ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও এই ধরনের কথাই বলেছেন, "Indeed Khetramani of the drama was none but Haramani, a peasant girl of Nadia in flesh and blood known as one of the beauties of Krishnagar who was carried off to the Kulchikatta factory in charge of Archibald Hills the Chota Saheb, where the girl was kept in his bed room till late hours of the night and the kind magistrate of Amarnagar was no other person than Mr.W.J. Herschel, grandson of the great astronomer. এই সব সাক্ষ্যের বলে স্বীকার করে নেওয়া চলে যে নীলদর্পণের ঘটনা-ভিত্তি অনেকটাই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনীমাত্র ঐতিহাসিক কাহিনী নয়। সমাজে-সংসারে প্রতিনিয়ত কত ঘটনাই ঘটছে। এই ঘটনাবলী ইতিহাসের গতিস্রোতের বাইরে নয় ঠিকই, কিন্তু এর প্রত্যেকটি ঘটনাই ঐতিহাসিক এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। আমরা সকলেই ইতিহাসের বিপুল গর্ভে বাস করছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে

[illegible] না। কোন ঘটনা বা ব্যক্তিত্বকে ঐতিহাসিক হয়ে উঠবার জন্যে একটা প্রবল প্রভাব লাভ করতে হয়। ব্যাপকতাই ঐতিহাসিকতার মানদণ্ড নয়। কোন ব্যক্তির অতিবিখ্যাতি তার ঐতিহাসিকতার মানদণ্ড নয়। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাঁরাই আছেন যিনি সমগ্র জাতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখেন, একটা যুগের উপর যার কর্ম ও চিন্তা বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ঐতিহাসিক ঘটনারূপে সেই সব ঘটনাকেই স্বীকার করা উচিত যার প্রভাব সমগ্র দেশবাসী কিংবা একটি কালখণ্ডব্যাপী অনুভূত হয়। সে-ঘটনা এবং সে-ব্যক্তিত্ব অবশ্যই সত্য হবে, কিন্তু সেটি প্রধান শর্ত, একমাত্র লক্ষণ নয়।

এই কথাটি আমরা সচরাচর মনে রাখি না। তাই আমাদের ইতিহাস ভরে রয়েছে রাজারাজড়াদের কাহিনীতে। রাজশক্তি পরিচালনাকেন্দ্রে অবস্থান করায় তাঁরা অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন ঠিকই। কিন্তু মাত্র সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় অত্যন্ত বিস্ময়কর অজ্ঞতার পরিচয় দিই আমরা। সমাজজীবনের বুকের মধ্যে যে ঐতিহাসিক শক্তি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে তার কপালে রাজটীকা থাকে না বলে অনেক সময় আমরা তাকে চিনতে পারি না। এই দৃষ্টিহীনতার জন্য রাজাদের ব্যক্তি-জীবনের সমস্যাকে এবং পারিবারিক প্রশ্নকেও ইতিহাস বলে জানি আর প্রজাদের জীবনমূলে নাড়া দেয় যে প্রবল জাতীয় আলোড়ন তার দিকে ফিরেও তাকাই না।

পাশাপাশি একটি কথা মনে রাখবার মত যে বাস্তব ঘটনাই ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। নীলদর্পণ নাটকে বর্ণিত কাহিনী বাস্তব হতে পারে, কিন্তু তা ঐতিহাসিক নয়। গোলক বসুর পরিবারের মত [illegible]তেলির মিত্র পরিবার ধ্বংস হয়েছিল বা ক্ষেত্রমণির কাহিনী আসলে

হারামণির কাহিনীর অনুরূপ এ তথ্য আমাদের কোন দিক থেকেই বিশেষ সাহায্য করে না। এই বস্তুভিত্তি থাকায় নাটক হিসেবে এদের সৌকর্য বেড়েছে, এমন দাবি করা চলে না; ঠিক তেমনি এই বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করার জন্যই একে ঐতিহাসিক নাটক বলে অভিহিত করাও যায় না। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫০ লক্ষ নীলচাষী যে ধর্মঘট করেছিল তা কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই ঘটনার মধ্যে নীলকর সাহেবদের দীর্ঘকালীন অত্যাচার এবং অত্যাচারিত চাষীদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ফেটে পড়েছিল। অথচ এ ঘটনাটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনা বলা চলে না। বরং হারামণির লাঞ্ছনা বা গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের বিপর্যয়ের ঘটনাকে বলা চলে প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনা, কারণ এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটত। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যে অগ্নিগর্ভ বেগ অনুভূত হয়, তা পূর্ববর্তী ঘটনাস্রোতের একটা উঁচু স্বরে বাঁধা ক্লাইম্যাক্স অথবা পরবর্তী ঘটনাবলীর উপরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করার শক্তিধারী। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহ উপন্যাসের ভিত্তিতে যে সংগ্রামকে স্থান দিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক কাহিনীর মর্যাদাসম্পন্ন, কারণ রাজপুত ও মোগল উভয়ের ইতিহাসে সে যুদ্ধঘটনার গুরুত্ব অত্যধিক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান নাটকে আসফ খাঁ-জাহাঙ্গীরের দ্বন্দ্বের যে চিত্র অঙ্কিত ইতিহাসে তার স্থান হলেও 'ঐতিহাসিক' তাকে বলা চলে না। রাজকীয় স্তরে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাই ঐতিহাসিক পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত—কিন্তু তা-ই কি সত্যকার ইতিহাস? সমগ্র জাতির জীবনস্পন্দনের স্বর তাতে বাজে কি?

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা চলে, নীলদর্পণের সাহিত্যের আস্বাদনে যার ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য।

এক। নীলদর্পণের অবলম্বনীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে বস্তুগত সত্যতা থাকতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা বলে তারা গ্রাহ্য নয়।

দুই। নীলদর্পণের কোন কোন চরিত্রের ভিত্তিতে একাধিক বাস্তব মানুষ আছে, অথচ এর কোন চরিত্রই ঐতিহাসিক নয়।

তিন। নীলচাষকে কেন্দ্র করে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল এবং চাষী ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল তা ক্রমে রাজনৈতিক গুরুত্ব পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসে সে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়; বাংলার ইতিহাসের একটা পর্ব ধরে নীলচাষকে কেন্দ্র করে যে মনোবিক্ষোভ এবং চাষীতে-নীলকর সাহেবে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সংঘাত চলছিল তা শীর্ষে উঠল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত নীলচাষীদের সাধারণ ধর্মঘটে। এই ধর্মঘট যেন ঘটনাগত প্রবলতা ও তীব্রতায় বাংলা দেশের সমগ্র নীলচাষপর্বটির প্রাণতরঙ্গকে প্রকাশ করল। এরূপ ঘটনারই ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে উঠবার দাবি সর্বাধিক।

নীলদর্পণ নাটকে যেসব ঘটনাকে ভাষারূপ দেওয়া হয়েছে তাদের ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে না এবং যেসব চরিত্র এ নাটকের কেন্দ্রে তাদেরও "ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব" অভিধায় ভূষিত করা যায় না। নীলদর্পণ নাটক যদি নীলচাষীদের ধর্মঘটকে অবলম্বন করত তা হলেও বলা যেত যে ঐতিহাসিক ঘটনাই এর বিষয়।

কিন্তু তবুও নীলদর্পণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকতার প্রশ্নটি এসে পড়ে। তার প্রত্যক্ষ কারণ একটি আছে। নীলচাষীদের ধর্মঘটের ঐতিহাসিক ঘটনাটি বিবৃত না হলেও বর্তমান নাটকে এমন পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে যাতে গভীরনাদী আন্দোলনের সুর সহজেই বেজে ওঠে।

এটি প্রত্যক্ষ কারণ; কিন্তু আর একটি অপ্রত্যক্ষ অথচ গভীরতর কারণ আছে, সেটিই বর্তমানে আমাদের প্রধান আলোচ্য।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'ঐতিহাসিক রস' নামক একটি অভিনব ও জটিল রসাস্বাদের প্রসঙ্গ তুলেছেন। একটু বিস্তৃত হলেও এক্ষেত্রে তার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি অনিবার্য বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের অলংকারে নয়টি মূল রসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্র রস আছে, অলংকার শাস্ত্রে তাহার নাম-করণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক-রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থান-পতন-ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে।... পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থান-পতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্র-গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে, সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূল রাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।"

[ঐতিহাসিক উপন্যাস : সাহিত্য]

রবীন্দ্রনাথ-কথিত এই ঐতিহাসিক রসস্ফুরণে কোন উপন্যাস বা নাটক যদি সার্থকতা লাভ করে তবেই তার সাফল্য। ঘটনাগত সত্যতার জন্য কোনকালে কেউ সৃজনধর্মী সাহিত্যের উপর নির্ভর করে না। ইতি-হাসের তথ্যের খোঁজে ঐতিহাসিক নাটক পড়ার কল্পনাও অস্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত এই সংজ্ঞা ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যকে রাজা-বাদশাহদের আশ্রয় থেকে মুক্ত করেছে। জনজীবনে মহাকালের গতিস্রোতে যে প্রবল কোলাহল জেগে ওঠে তাকেই গৌরব দেওয়া হয়েছে।

নীলদর্পণ নাটকে গ্রামের চাষাভুষা-সাধারণ লোকের কথা বলা হয়েছে। নীলকর সাহেবেরা অত্যাচারে বড় হলেও কালের তরঙ্গে স্থান লাভের যোগ্য নয়; তারাও সাধারণ মানুষ। কিন্তু সমগ্র নাটকটির বুক চিরে গ্রামাঞ্চলের একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্তনাদ আকাশকে স্পর্শ করেছে। এ যন্ত্রণা একজন ব্যক্তির নয়, সমগ্র গ্রামের—সম্ভবত ভূমির সঙ্গে সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক মানুষের। নবীনমাধবদের পরিবার বিপর্যস্ত হয়েছে, সেই একটি পরিবারে নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্যে মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা, মস্তিষ্ক-বিকৃতি অনেকগুলি ঘটেছে। কিন্তু দীনবন্ধু বর্ধিষ্ণু একটি কৃষি-ভিত্তিক ভদ্র পরিবারের সর্বনাশে তাঁর অন্তর-বাণীকে পূর্ণ প্রতিফলিত হতে দেখেন নি। নীলচাষবিষয়ক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দীনবন্ধুর অন্তরে যে ব্যাপক সর্বনাশের আতঙ্ক জাগিয়েছিল তা একটি মানুষের নয়, একটি পরিবারের নয় এবং মুখ্যত কোন বর্ধিষ্ণু পরিবারের তো নয়ই। ফলে দীনবন্ধুকে সাধুচরণ-ক্ষেত্রমণিদের কাহিনীকে গুরুত্ব দিতে হয়েছে। ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচার এবং পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুর মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কন করতে হয়েছে। তারও পরে রায়তদের চিত্রেও লেখকের হৃদয়ের আকুতি আপনাকে পূর্ণভাবে ঢেলে দিয়েছে। সব মিলে তাঁর একটিই চেষ্টা—কতটা ব্যাপকতার সুর বাজান যায়, সমগ্র কৃষক সমাজের ধ্বংসমুখীন হাহাকার এবং প্রতিরোধ বাসনাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।

নীলদর্পণ বাংলা দেশের নীলচাষের দর্পণ তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই

দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে কিছু অধিকতর ব্যঞ্জনা। এবং সে ব্যঞ্জনা ইতিহাসের তথ্যকে যতটা না নির্দেশ করে ততটা ইঙ্গিত করে ইতিহাসাশ্রিত একটা বিশিষ্ট আস্বাদের দিকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে সারা উনবিংশ শতক জুড়ে বাংলা দেশে গ্রাম-জীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। বৃটিশশক্তি প্রবর্তিত নূতন কৃষি-ব্যবস্থা গ্রাম-জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনছিল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার অশুভ ফল ফলছিল, গ্রাম্য কৃষক-জীবন এই নূতন অবস্থায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ছিল। প্রতিনিয়ত শোষণ এবং দুর্বিষহ অত্যাচারে কৃষক শ্রেণীর অন্তরের চাপা আক্রোশ মাঝে মাঝে বিদ্রোহে ফেটে পড়ছিল। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, রাঢ়ের কোল বিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলন এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নীলচাষীদের আন্দোলনকে এই পটভূমিকায় স্থাপিত করে দেখলে তার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। সমগ্র বাংলা দেশের কৃষকসমাজ তখন অত্যাচারে বিক্ষত হচ্ছিল, বিক্ষোভে কাঁপছিল তরঙ্গিত লাভাগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত। কলকাতা শহরে তখন নবীন যুগদেবতার অভ্যুত্থান হচ্ছে। বাংলার গ্রামও নবজন্মের যন্ত্রণা বহন করছে তার সর্বদেহে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়তি সেখানে নূতনকে বরণ করে আনে নি। এই যন্ত্রণা ও বিস্ফোরণমুখী মনোভাব যেন সমগ্র নীলদর্পণ নাটককে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে রেখেছে।

নীলদর্পণের কাহিনীতে চরিত্রগুলিকে ছাপিয়ে স্বরপুরের সর্বনাশ, নবীনমাধবদের পারিবারিক বিপর্যয়, ক্ষেত্রমণির লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে সমগ্র বাংলা দেশের সমকালীন কৃষকশ্রেণীর অন্তরলোকের ভাবরসটিকে প্রতিফলিত করেছে। সেদিক থেকে নীলদর্পণ বাঙালি কৃষকজীবনের একটা যুগের মহানাটকের ভূমিকা নিয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ক্ষেত্রমণিদের কাহিনীকে সেদিক থেকে পার্শ্বকাহিনী বলা যেতে পারে। কিন্তু নাটকের পার্শ্বকাহিনীর যেমন ঘনিষ্ঠভাবে মূল-কাহিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এখানে তেমন কিছু ঘটে নি। দুটি কাহিনী যেন অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ক্ষেত্রমণির উদ্ধারসাধনকার্যে নবীনমাধবের উপস্থিতি সম্পর্কের এই শিথিলতাকে অপসারিত করতে পারে নি, ঘনীভূত করে তোলে নি। তা ছাড়া নাটকে এমন কয়েকটি দৃশ্য আছে যা প্রাণবন্ত হলেও নবীনমাধব বা ক্ষেত্রমণির কাহিনীর সীমায় ধরে রাখবার মত নয়। নীলকুঠির বন্দী রায়তদের কথা নাটকের প্রয়োজন ছাপিয়ে বিস্তৃতি পেয়েছে। পদী ময়রাণীকে কেন্দ্র করে, কিংবা গোপী নায়েবের কথায়ও নাটক কিছু অধিক বিস্তার লাভ করেছে।

নাটকটির উদ্দেশ্য অবশ্য আদ্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকটি ঘটনাই একদিকে নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচারী রূপ অন্যদিকে অত্যাচারিত মানুষের জীবনকে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছে। কিন্তু কার্য-কারণের সূত্র ধরে সব ঘটনাংশ মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লট গড়ে ওঠে নি। পৃথক ভাবে নবীনমাধবদের ঘটনায় একটি কার্য-কারণ সূত্রে বিদ্ধ অখণ্ড কাহিনীর রূপ লক্ষ্য করা যায়; খুব সরল হলেও ক্ষেত্রমণির উপকাহিনীতেও পারম্পর্যপূর্ণ গল্পরস খোঁজা যেতে পারে। কিন্তু সব মিলে উদ্দেশ্যের ঐক্য থাকলেও কাহিনীর মধ্যে ঐক্য মিলবে না।

এর জন্য কাহিনীগ্রন্থনে দীনবন্ধুর নিপুণতার অভাব যে অনেকটা দায়ী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আরও একটি কারণ আছে। দীনবন্ধু নীলচাষীদের জীবনে ঘনীভূত সর্বনাশের ব্যাপক চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন। খুব সচেতনভাবে না হলেও তিনি অনুভব করেছিলেন যে বহু মানুষের জীবনের বিপর্যয় এবং অন্তরের ক্ষোভ ও ক্রোধের

চিত্ররূপে এ নাটককে উপস্থিত করতে না পারলে নাটক হিসেবে এর আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটি পরিবারের সর্বনাশ সাধনের কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকলে এর মধ্যেকার ব্যাপকতর উপলব্ধিটি অনেকাংশেই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাবে। বিশেষ করে নবীনমাধবদের যে কাহিনীকে তিনি নাটকের কেন্দ্রে স্থাপিত করেছেন তার চেয়েও দরিদ্র কৃষকের সর্বস্বান্ত হবার উপরেই দীনবন্ধুর শিল্পীপ্রাণের সহানুভূতির আলো অধিক পড়েছিল। সেই কৃষককুলের অবস্থার চিত্র আঁকা চাই। অথচ নবীনমাধবের কাহিনীর মধ্যে তাদের পরিপূর্ণ ভাবে আমন্ত্রণ জানানোও সম্ভব ছিল না। কাহিনী তাই ঐক্য হারাল।

একটি পরিবারের সর্বনাশের ঘটনায়, একটি ব্যক্তির পতনে একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের জীবনসঙ্গীত বাজানো যায় না এমন মনে করবার কারণ নেই। বরং সাহিত্যে সেই সাধনাই করে। বহু মানুষের কথা বলতে গিয়ে, বৃহৎ সমাজের প্রাণস্পন্দন ধরবার চেষ্টায় একটি মানুষ ও একটি পরিবারকেই সে আশ্রয় করে। একটি পরিবারের কাহিনীতে সমগ্র সমাজের আলোড়ন ও কোলাহল যেন প্রতিধ্বনিত হয়, একটি মানুষের ধমনীতে একটা বৃহৎ সম্প্রদায়ের রক্তস্রোত অনুভব করা যায়। কিন্তু তা অনুভব করবার মত শিল্পীপ্রাণ এবং রূপায়িত করবার শিল্পনৈপুণ্য দীনবন্ধুর ছিল না একথা মেনে নেওয়া উচিত।

বাধা আরও ছিল। দীনবন্ধু যে রসের সাধনা করেছিলেন এ নাটকে, নবীনমাধবের পরিবার তার আধার হতে পারে না কোনমতে। দীনবন্ধু নীলদর্পণ লিখেছিলেন, সুতরাং তার যে অনেকখানি ইতিহাস-বোধ ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ইতিহাসের বিচারে সম্পন্ন কৃষিভিত্তিক পরিবার—শিক্ষায় ও চিন্তায় যারা সহরবাসী মধ্যবিত্তের সমশ্রেণীভুক্ত—এদেশের চাষী-বিদ্রোহের প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারে না; চাষীর জীবনের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্বও

তাদের উপর সম্পূর্ণত আরোপ করা চলে না। তার উপরে তাঁর শিল্পীপ্রাণও নবীনমাধবদের ন্যায় মানুষদের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করত না। সেক্ষেত্রে কাহিনীকেন্দ্রে নবীনমাধবদের উপস্থিত করা নাট্যসার্থকতার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াবেই।

কিন্তু কেন দীনবন্ধু নবীনমাধবদের কেন্দ্র করে নীলদর্পণের কাহিনীবৃত্ত রচনা করলেন? তিনি স্বাধীনভাবেই তো কাহিনী তৈরী করেছেন। এক্ষেত্রে নাট্যকার প্রথাদ্বারা শাসিত হয়েছেন বলে মনে হয়। কৃষকজীবনকে আশ্রয় করে নাটক রচনার কথা তখনকার শিক্ষিত সমাজ কল্পনাও করতে পারত না। ছোটখাট প্রহসন রচনায় তারা স্থান পেতে পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গভীর ভাবাত্মক নাটকে তাদের কাহিনীকে কিছুতেই প্রাধান্য দেওয়া চলে না। এই প্রথা লঙ্ঘন করবার মত বিদ্রোহী সাহসিকতা দীনবন্ধুর ছিল না। সম্ভবত অতখানি সাহিত্যিক দূরদৃষ্টিও তাঁর করায়ত্ত ছিল না।

কেন্দ্রীয় চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই ধরনের অস্পষ্টতা ও দ্বিধাহীন দৃঢ়তার অভাব প্রতিফলিত হয়েছে। নবীনমাধব দুটি কারণে এই নাটকের নায়ক হতে পারে না।

এক। এ নাটক যাদের প্রাণের কথা সেই চাষীদের সঙ্গে তার যোগ সহানুভূতির হতে পারে, কিন্তু তা অঙ্গাঙ্গী প্রাণের সম্বন্ধ নয়। তাদের যে নেতা, সে হবে তাদেরই একজন—তাদের মত অমার্জিত, অশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ। তাদের ভীতি তাকে স্পর্শ করবে না, তাদের স্থূল রসিকতার সে নিত্যসঙ্গী, তাদের অব্যক্ত ক্রোধ তার মধ্যে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে। ভদ্র, নিস্তেজ, বক্তৃতাসর্বস্ব এবং সম্পন্ন শ্রেণীর নবীনমাধব শুধু পরোপকার ও সহানুভূতির বলে এই নায়কত্ব লাভ করতে পারে না। জীবনে নবীনমাধবের মত ব্যক্তিরা এই

নায়কত্বের দাবীদার হতে পারে কি না, সে চিন্তা আমাদের নয়। কিন্তু সাহিত্যে এরূপ ঘটালে সুরে সঙ্গতি আসে না। এ নাটকে তাই মুহুর্মুহু তাল কেটে গিয়েছে।

দুই। নবীনমাধব-জাতীয় মানুষদের প্রতি স্রষ্টা দীনবন্ধুর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর শিল্পীপ্রাণের গভীর প্রীতি ছিল না। যাকে নিয়ে স্রষ্টার উল্লাস নেই, সৃষ্টি-কর্মের নায়ক হওয়া তার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

অথচ তোরাপ বা ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তিকে নায়ক করে নাটক রচনার কথা সেদিন ছিল কল্পনারও অতীত।

•

দীনবন্ধু যাদের কথা বলতে চেয়েছেন তাদের কাহিনীকে মুখ্য করে তুলতে পারেন নি ; যাদের কথা তাঁর শিল্পী-প্রাণকে গভীরভাবে নাড়া দিতে পারে না তাদের কেন্দ্রে রেখে তাঁকে কাহিনী গঠন করতে হয়েছে। যাকে নায়ক করবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুলতা বোধ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত ভূমিকার স্থান হল নাট্যকাহিনীর প্রান্তে, আর যার প্রতি কোন আকর্ষণই বোধ করেন না তিনি, তাকে নায়ক ফেঁদে ট্রাজেডি রচনায় তাঁকে ব্রতী হতে হল—এটাই শিল্পী দীনবন্ধুর ট্রাজেডি।

কখনও কখনও শিল্পীকে বিদ্রোহীর মূর্তিতে দেখা দিতে হয়। দীনবন্ধু যে শিল্পী ছিলেন তাতে সন্দেহ করা চলে না, কিন্তু বিদ্রোহী-শিল্পী না হওয়ায় আপন শিল্প-ক্ষমতার সামান্য পরিচয়ই তিনি রেখে যেতে পেরেছেন।

॥ চার ॥

দীনবন্ধু শিল্পী হিসেবে রিয়ালিষ্ট। হৃদয়ের বর্ণসম্পাত ব্যতিরেকে বস্তুর চিত্র তিনি নিপুণভাবে আঁকতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে